ভোটারদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিয়ে দুরভিসন্ধি

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৪ আগষ্ট, ২০০৬)

কল্পনা করুন, আপনি আপনার বাড়ির বাইরে। আপনি তৃষ্ণার্ত। আপনি দোকানে থেমেছেন একটি পানির বোতল কেনার জন্য। দোকানের শেলফে অনেকগুলো ব্র্যাণ্ডের পানির বোতল সাজানো আছে। সবগুলোর দাম প্রায় সমান। আপনি কোনটি কিনবেন? ভোক্তা হিসেবে সিদ্ধান্তটি গ্রহণের জন্য বোতলের গায়ে বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে তথ্য দেয়া আছে – যেমন, ক্যালসিয়াম, আয়রন, আয়োডিন, ফ্লোরাইড ইত্যাদির কোনটির পরিমাণ কতটুকু। বোতল প্রস্তুতকারক ভুল তথ্য দিলে ভোক্তা হিসেবে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার এখতিয়ার আপনার রয়েছে।

পক্ষান্তরে, কল্পনা করুন, আপনি সংসদ নির্বাচনের সময়ে ভোট দেয়ার জন্য কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছেন। বিভিন্ন দল থেকে বেশ কয়েকজন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। চারদিকে তাদের পোস্টার ও দেয়াল লিখন। তাদের কর্মীরা আপনাকে নিয়ে টানাটানি করছে। আপনি সর্বোৎকৃষ্ট প্রার্থীকে ভোট দিতে চান। কিন্তু কিভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন? আপনার কাছে বিভিন্ন প্রার্থী সম্পর্কে কি নির্ভরযোগ্য তথ্য আছে?

এক বোতল পানি কেনার মতো ক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ক্রেতার থাকলেও, প্রতিনিধি নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভোটার হিসেবে প্রার্থীদের সম্পর্কে জানার অধিকার একবছর আগেও আপনার ছিল না। সৌভাগ্যবশত গত ২৪ মে, ২০০৫ বাংলাদেশ হাইকোর্ট একটি যুগান্তকারী রায়ে আপনার এ অধিকার আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ***আব্দুল মোমেন চৌধুরী এবং অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ*** মামলার রায়ে আদালত নির্বাচন কমিশনকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রার্থী থেকে মনোনয়নপত্রের সাথে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী হলফনামার আকারে সংগ্রহ এবং এগুলো গণমাধ্যমকে দিয়ে জনগণের মাঝে প্রচার করার নির্দেশ প্রদান করেছেন: (ক) সার্টিফিকেটসহ প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা; (খ) বর্তমানে তাদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত ফৌজদারী অপরাধের অভিযোগের তালিকা (যদি থাকে); (গ) অতীত ফৌজদারী মামলার তালিকা ও ফলাফল; (ঘ) প্রার্থীর পেশা; (ঙ) প্রার্থীর আয়ের উৎস এবং উৎস সমূহ ; (চ) অতীতে সংসদ সদস্য হলে জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকার বর্ণনা; (ছ) প্রার্থী ও প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের সম্পদ এবং দায়-দেনার বর্ণনা; এবং (জ) ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে এবং কোম্পানী কর্তৃক – যে কোম্পানীতে প্রার্থী চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক কিংবা পরিচালক – গৃহীত ঋণের পরিমাণ ও বর্ণনা। এসকল তথ্য ভোটারদের মধ্যে বিতরণের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করা।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী সম্পর্কে ভোটারদের জানার অধিকারের পক্ষে আদালত গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি উত্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী, প্রার্থীদের সম্পর্কে "জনগণের জানার অধিকার রয়েছে, যা তাদের ভোটাধিকারের অন্তর্ভূক্ত।" তবে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট এ ব্যাপারে আরো শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের মতে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকার ভোটারদের বাক স্বাধীনতার অর্থাৎ মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আদালত ***ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া বনাম এসোসিয়েসন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস*** (2002(5)SCC) মামলায় প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক রায়ে বলেন: "নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার মানেই ভোটারদের স্বাধীনভাবে প্রার্থী নির্বাচনের অধিকার। এক্ষেত্রে ভোটাররা মত প্রকাশ করেন ভোট প্রদানের মাধ্যমে। একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তিও তার প্রার্থী সম্পর্কে – যে প্রার্থী সংসদে তার প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং তার সম্পদ ও স্বাধীনতা সুরক্ষায় আইন প্রণয়ন করবেন – পরিপূর্ণ তথ্য জানার অধিকার রাখে। যাতে করে সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি একজন আইনভঙ্গকারীকে আইন প্রণেতা হিসেবে নির্বাচন করবেন কিনা তা পূর্বাহ্নেই বিবেচনায় আনতে পারেন।"

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, হাইকোর্টের রায় আইনের সমতুল্য। এছাড়াও সংবিধানের ১১২ অনুচ্ছেদে উচ্চ আদালতের রায় বাস্তবায়ন করা সকল নির্বাহী বিভাগের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং আদালতের জোরালো যুক্তি সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশত আমাদের নির্বাচন কমিশন হাইকোর্টের উপরিউক্ত যুগান্তকারী রায়টি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছেন।

আমাদের নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা

নির্বাচন কমিশন গত ২০ জুলাই, ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সুনামগঞ্জ-৩ আসনের উপনির্বাচনে হাইকোর্টের রায়টি বাস্তবায়নের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কমিশনের প্রচেষ্টা ছিল আন্তরিকতাহীন ও অত্যন্ত ক্ষীন। উদাহরনস্বরূপ, ১৮ জুন, ২০০৫ তারিখে কমিশনের পক্ষ থেকে উপনির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার ও সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসকের কাছে এক প্যারার একটি পরিপত্র প্রেরণ করা হয়। পরিপত্রে রিটার্নিং অফিসারকে আদালতের রায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ" করা হয়।

সুনামগঞ্জের পর গত এক বছরে ফরিদপুর-১ , দিনাজপুর-১ , মানিকগঞ্জ-৪ এবং গাইবান্ধা-৪ আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও সংরক্ষিত নারী আসনেও এ সময়ে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এ সকল নির্বাচনেও নির্বাচন কমিশন জোরালো কোন পদক্ষেপ নেন নি। ফলে প্রার্থীরা আদালতের নির্দেশ ন্যূনতমভাবে মান্য করার খাতিরে নামকাওয়াস্তে হলফনামা দাখিল করেন। তা সত্ত্বেও 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে লিখিতভাবে অনুরোধ করেও নির্বাচন কমিশন কিংবা সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে আমরা হলফনামার কপি পাইনি, যদিও আমাদের চাপে রিটার্নিং অফিসার এগুলোর একটি সারাংশ প্রকাশ করেন।

প্রকাশিত সারাংশ বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে, এগুলো অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্যে ভরপুর এবং প্রার্থীগণ ব্যাপকভাবে তথ্য গোপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সুনামগঞ্জ-৩ উপনির্বাচনে একজন প্রার্থী তার শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে লিখেন "প্রযোজ্য নয়"। একইভাবে অনেক প্রার্থীই দেখান যে, তাদের হাতে কোন নগদ অর্থ বা তাদের কোন ব্যাংক একাউন্ট নেই। সম্পদের হিসাব এবং ফৌজদারী মামলার তালিকা প্রদানের ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে তথ্য গোপন করা হয়েছে। যদিও প্রায় সকল প্রার্থীই আদালতের রায় আক্ষরিকভাবে এবং এর মূল চেতনা নগ্নভাবে অমান্য করেছেন, তবুও নির্বাচন কমিশন তাদের বিরুদ্ধে কোন রূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনি প্রেক্ষাপটে আমরা কয়েকজন নাগরিক হাইকোর্টের রায় পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য আদালতের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়ার আর্জিতে একটি রিট আবেদন পেশ করি, যার ভিত্তিতে বিবাদীদের বিরুদ্ধে রুলনিশি জারি করা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের রিট শুনানির এখতিয়ার তুলে নেয়ার ফলে মামলাটির শুনানি করানো সম্ভব হচ্ছে না।

উল্লেখ্য যে, **গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২**-এর ৪৪এএ ধারা অনুযায়ী, সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময়সীমা পার হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে তাদের নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস, সম্পদ, দায়-দেনা, বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং আয়কর রিটার্নের কপি রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দেয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে ফি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করেও এসকল তথ্য পাওয়া যায় নি, যদিও নির্বাচন কমিশন আইনগতভাবে এগুলো দিতে বাধ্য। এমনকি কমিশন আমাদের পত্রের উত্তর প্রদানেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। তাই এটি সুস্পষ্ট যে, কমিশন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সমুন্নত রাখতে সক্ষম হন নি।

ভোটারদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিয়ে দুরভিসন্ধি

আমাদের নির্বাচন কমিশন আদালতের রায় পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নেই শুধু ব্যর্থ হননি, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য জানার ভোটারদের অধিকারকে পদদলিত করার একটি অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন বলে আশঙ্কা হয়। আমাদের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কিছুদিন আগে দাবি করেছেন যে, যেহেতু হাইকোর্টের রায়ে কোন শাস্তির বিধান নেই, তাই এটি মানার কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। কারণ রায়টি ডিরেক্টরি (directory), ম্যান্ডেটরি (mandatory) নয়।

আইনজ্ঞদের মতে, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এ দাবি সঠিক নয়। কারণ আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র আদালতের রায় ঐচ্ছিক বা ডিরেক্টরী হতে পারে। অর্থাৎ আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যদি 'shall' শব্দটি ব্যবহার এবং শাস্তির বিধান রাখা না হয়, তাহলেই সে ব্যাখ্যা মানা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য ঐচ্ছিক। আদালতের অন্য সকল রায় মানা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। এছাড়া রায় মানা বাধ্যতামূলক না হলে আদালতের প্রয়োজনীয়তাই বা কি? তাই আমাদের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার আদালতের রায়ের অপব্যাখ্যা দেয়ার অপপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন বলে মনে হয়, যা একজন বিজ্ঞ বিচারপতির কাছ থেকে কোনভাবেই আশা করা যায় না।

উল্লেখ্য যে, আমাদের সংবিধানের **১১৯** অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ***আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাশেম*** (৪৫ডিএলআর(এডি)(১৯৯৩)) মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ রায় দেন যে, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করার স্বার্থে সংবিধানের 'তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ' ক্ষমতার অধীনে আইনের বিধানের সঙ্গে সংযোজন করার এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করা হয়েছে। তাই ইচ্ছা করলেই নির্বাচন কমিশন অনেক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় মাননীয় হাইকোর্টের রায়কে ভণ্ডুল করার আরেকটি অপচেষ্টা বর্তমানে চলছে। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, মো: আবু সাফা নামে জনৈক ব্যক্তিকে সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ একতরফা শুনানির পর রায়টির বিরুদ্ধে আপিল করার অনুমতি দেন, যদিও জনাব সাফা এ মামলার কোন পক্ষ ছিলেন না। সর্বোপরি এ আপিলের ব্যাপারে মামলার মূল বাদীদেরকে কিংবা তাদের উকিলদের বরাবরে কোন নোটিশ জারি করা হয় নি, যা করা বাধ্যতামূলক। পুরো বিষয়টিই সম্পূর্ণ গোপনীয়তার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে। অনেকের কাছেই তাই পুরো বিষয়টিই অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য। এছাড়াও বহু প্রচেষ্টা চালিয়েও এ পর্যন্ত জনাব সাফাকে খুঁজে বের করা যায় নি।

জনাব আবু সাফা তার আপিলে বলেন যে, তিনি তার এলাকায় জনপ্রিয় এবং তিনি সংসদ সদস্য হওয়ার আশা পোষণ করেন, যদিও তিনি মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। তাই হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য প্রদান করলে নির্বাচনে তিনি বৈষম্যের শিকার হবেন বলে তার আশংকা। কিন্তু হাইকোর্টের রায়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় স্বল্প শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার জন্য বলা হয় নি। এতে শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে ভোটাররা নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে জেনে-শুনে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কারণ তথ্য গণতন্ত্রের জীবনীশক্তি।

পরিশেষে, আমাদের সংবিধান অনুযায়ী জনগণ রাষ্ট্রের মালিক। তাই প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিদের দায়িত্ব জনস্বার্থ সমুন্নত রাখা এবং এ লক্ষ্যে সর্বদা সচেষ্ট হওয়া। এ সত্ত্বেও আমাদের নির্বাচন কমিশন ভোটারদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ভণ্ডুল করার দুরভিসন্ধিতে কেন লিপ্ত হয়েছেন তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। এ প্রসঙ্গে আমরা আশা করি যে, হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায়টি বহাল রাখা জনস্বার্থের অনুকূলে হবে – আপিল বিভাগ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। তবে, জনস্বার্থ সত্যিকারার্থে রক্ষা করতে হলে সচেতন নাগরিকদেরকে এবং গণমাধ্যমকে এখনই সোচ্চার হতে হবে।